৯২ সেকেন্ডে ৯৬ রাউন্ড গুলি ও ১২টি নরপশুর লাশ...

আরিফ খান মিরণ ও শামীম সুফী

২৭ মার্চ ১৯৭১। পরশু রাতে cwK¯vbx আর্মি ঢাকা শহরকে ea¨ fwg‡Z পরিণত করেছে। আজ ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সাইমন ড্রিং লিখেছে– লোকজন ঢাকা ছেড়ে cvjv‡"Q। দুপুর নাগাদ ঢাকা ফাঁকা হয়ে গেছে। জনস্রোতের মধ্য থেকে বিষণ্ন আর্তি ভেসে আসছে– 'আমি বৃদ্ধ, দয়া করে আমাকে গাড়িতে নিয়ে যান। আমার ছেলে মেয়েকে বাঁচান।' বিষণ্ন ও ভয়ার্ত মানুষগুলো পা টেনে টেনে চলছে আর iv¯vq হত্যাযজ্ঞের চিহ্ন দেখে বারে বারে শিউরে উঠছে।

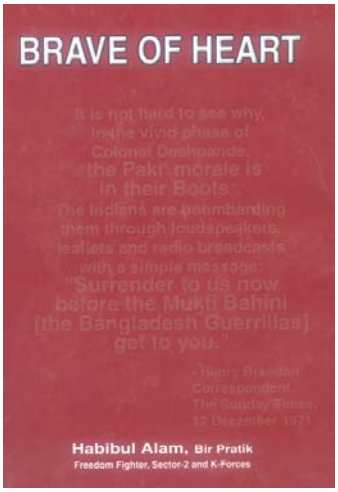

১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। দেশের টালমাটাল পরিস্থিতি। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম নেমে পড়েছে দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, সেনা সবাই। আর পরাধীনতা নয়, এবার দৃঢ় পদে মাথা তুলে দাঁড়াবার, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার পালা। এই দুর্বার সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য শলাপরামর্শ করছে ২০-২১ বছরের টগবগে এক তরুণ। বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে। অতএব তার জন্য সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটা শুধু আবদার করলেই বাবা-মা মেনে নেবে না। যাই হোক, এ চিন্তা পরে। তাকে যুদ্ধে যোগ দিতেই হবে। হানাদারদের নির্মম অত্যাচারের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। যুদ্ধের মাঠ থেকে সবে ফিরে এসেছে এ তরুণেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলী আহমেদ জিয়া উদ্দিন (পরবর্তীতে চাষী জিয়া নামে সমধিক পরিচিত)। বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, সে যুদ্ধে যাবে। এবার প্রস্তুতির পালা, মা-বাবা যেন টের না পায়।

একদিন ভোরে ফজরের নামাজের আগেই বিছানা ছাড়ল তরুণ। কোনো রকম কালক্ষেপণ না করে কোলবালিশটা বিছানার মাঝ বরাবর শুইয়ে দিয়ে ওটাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। খাটের ওপর মশারি টানানো। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কেউ একজন শুয়ে আছে। কোথায় যাচ্ছে, কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে- এসব জানার জন্য একটি ছোট্ট চিঠি লিখে সেটা পড়ার টেবিলে বই চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল তরুণটি। ব্যাগ আগে থেকেই গোছানো ছিল। অন্য বন্ধুরা পূর্বনির্ধারিত সময়ে পূর্বনির্ধারিত স্থানে মিলিত হয়ে রওনা দিল যুদ্ধের ময়দানে। যোগদান করলো মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেক্টর ২-এ। এতক্ষণ যুদ্ধযাত্রী যে তরুণটির কথা বলা হলো তিনি হাবিবুল আলম। তিনি এবং তার বন্ধুরা মিলে সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ঢাকার

‘ইতিহাস গেলানোর ব্যাপার না বোঝার ব্যাপার’

হাবিবুল আলম বীর প্রতীক
সেক্টর-২, কে ফোর্স

সাপ্তাহিক ২০০০ : যুদ্ধ শেষ হওয়ার এতো দিন পর কেন বই প্রকাশ করলেন?

হাবিবুল আলম : না, আমার বই লেখার চিন্তা মাথায় ছিল না। ১২ বছর আগে দুটো প্রবন্ধ লেখার জন্য কিছু কাজ করেছিলাম। এরপর বন্ধুবান্ধবরা ধরে বসল। ওদের প্রেসারেই বইটা হয়ে গেল।

২০০০ : আপনার বইয়ে প্রচুর উদ্ধৃতির ব্যবহার করেছেন। কেন?

হাবিব : হ্যাঁ প্রতিটি টপিক, সাব-টপিকের সঙ্গে মিলিয়ে আমি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির ব্যবহার করেছি। প্রতিটা উদ্ধৃতি একেকটা ম্যাসেজ বহন করে।

২০০০ : উদ্ধৃতির বেশির ভাগই কবিতা এবং বই শুরু হয়েছে খলিল জিবরানের একটি কবিতা দিয়ে। এর কি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে?

হাবিব : তা তো অবশ্যই আছে। আমি জিবরানকে উদ্ধৃত করেছি বিশেষভাবে অভিভাবকদের উদ্দেশে। তারা মনে করেন তারা তাদের সন্তানদের সবকিছু জানেন, বোঝেন। কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা তা নয়।

২০০০ : সেক্টর ২-এর অস্থায়ী কার্যালয় মতিনগর সম্পর্কে বলুন।

হাবিব : বইয়ে যদিও আমি সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করেছি, মতিনগর হলো সোনামোড়ার কাছে বর্ডারের ওপারে, বাংলাদেশের ভেতরে নয় ওটা।

২০০০ : কিন্তু মতিনগর থেকে আপনারা কেন মেলাঘরে স্থানান্তরিত হলেন?

হাবিব : নিরাপত্তার প্রশ্নই এর মূল কারণ ছিল। মতিনগর জায়গাটা নিরাপদ ছিল না। মেলাঘর ছিল মতিনগর থেকে ভারতের আরো ভেতরে। প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার ভেতরে। তাই ঐ জায়গাটা অধিকতর নিরাপদ ছিল।

২০০০ : আপনার বইয়ে ‘অপারেশন পাওয়ার স্টেশন’ নামে একটি অধ্যায় আছে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

হাবিব : এই অপারেশনের আওতায় ঢাকা শহরের পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র একসঙ্গে উড়িয়ে দেয়ার কথা। কিন্তু আমরা দুটোতে সফল হয়েছিলাম। অসফলতার মূল কারণ ছিল, স্টেশনগুলোতে ওরা প্রচুর সেনা এনে রেখেছিল। কোথায় কোথায় হামলা হতে পারে এ ব্যাপারে হয়তো ওদেরও একটা অনুমান ছিল। যে দুটি স্টেশন উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিল তার একটির নেতৃত্বে ছিলেন গাজী দস্তগীর বীর প্রতীক (গাজী ট্যাঙ্কের মালিক)। আর অন্যটার (গোলবাগ পাওয়ার স্টেশন) নেতৃত্ব দিয়েছে সায়ীদ এবং বুলু। তিনটিতে সফল না হলেও আমাদের উদ্দেশ্য যা ছিল তা ঠিকই হাসিল হয়েছিল। যেমন কাঁটাবন মসজিদের উল্টোপাশে যে পাওয়ার স্টেশনটা, আমরা সেটার কাছে গেলাম। স্বপনের দায়িত্ব ছিল বিস্ফোরক নিয়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়া। সে ঢুকে গিয়েছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ গুলিবিদ্ধ হয়। এ পরিস্থিতিতে যে ছেলেটা কাভার দেয়ার কথা সে ছিল নতুন। ফলে আমাকে কাভার দিতে হলো। স্টেশন ওড়ানো তো পরে, আগে স্বপনকে বাঁচাতে হবে। ফলে এ অপারেশনও ব্যর্থ। কিন্তু গুলাগুলিপূর্ণ এই উত্তাল পরিস্থিতি বিবিসি সঙ্গে সঙ্গে টেক করে এবং প্রচার করে। ফলে ঢাকার পরিবেশ পরিস্থিতি যে সুস্থ স্বাভাবিক নয় তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জেনে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করছে, শুধু থ্রি নট থ্রি রাইফেল নয়। ওখানেই আমি প্রথম চাইনিজ অস্ত্র ব্যবহার করি। বিবিসি সাড়ে ৮টার খবরে অপারেশনের এসব খবর প্রচার করেছিল। খালেদ মোশাররফ দারুণ খুশি হয়েছিলেন।

ভেতরে পুরোদমে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়েছেন, অংশগ্রহণ করেছেন একটার পর একটা সফল গেরিলা অপারেশনে।

তখনও ঢাকা স্বাধীনতাকামী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। তাই কৌশলগত, মানবিক ও আন্তর্জাতিক কারণেই ঢাকা এবং ঢাকার বিভিন্ন ঘটনা দেশ ও দেশের বাইরের যোদ্ধা আর কর্মীদের দারুণভাবে প্রভাবিত করতো। হানাদার দখলদার বাহিনী ঢাকাকে সম্পূর্ণ করায়ত্তে রেখে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচার চালাতে চাইতো এই বলে যে- পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই ঘটছে না, সবকিছুই সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু তাদের সেই ভন্ডামিপূর্ণ খায়েশকেই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ঢাকার অভ্যন্তরে সেক্টর ২-এর অধীনে যারা গেরিলা অপারেশন পরিচালনা করেছে। হাবিবুল আলম সেই দুঃসাহসী নগর গেরিলাদের একজন। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পর এই ২০০৬ সালে তিনি তার গেরিলাজীবন ও অভিজ্ঞতার কথা বই আকারে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। বইয়ের নাম Brave of Heart. বইটিতে ঢাকার অভ্যন্তরের গেরিলা কার্যক্রমের এবং পারস্পরিকভাবে সেক্টর ২-এর কার্যক্রমের যেসব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে একে শুধু যুদ্ধদিনের স্মৃতিকথা বলা যাবে না। লেখকের নিজে অংশগ্রহণ করা বিভিন্ন কার্যক্রম ও বন্ধু এবং সহযোদ্ধাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তারিখসহ তিনি যে তথ্য ও বর্ণনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তাতে বইটি নির্ভরযোগ্য একটি ইতিহাস গ্রন্থে রূপ লাভ করেছে। সেই হিসেবে ঢাকার অভ্যন্তরে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযান বা অপারেশনের তথ্য সংবলিত এই বই মুক্তিযুদ্ধেরই বহুমাত্রিক দিক উন্মোচনে একটি বৃহৎ ও স্বার্থক সংযোজন বটে।

হাবিবুল আলম ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে ১৭ জনের একটি দল নিয়ে দখলদার ও হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ঢাকায় প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন এই দলের নেতৃত্বে। ঢাকার অভ্যন্তরে তারা বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অপারেশন হলো ‘অপারেশন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল’, ‘অপারেশন পেট্রোলপাম্প’, ‘অপারেশন ঢাকা শহরের পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র’ ‘অপারেশন ফার্মগেট চেকপয়েন্ট’ ইত্যাদি।

রোমহর্ষক সেসব অপারেশনের বৃত্তান্ত লেখক তুলে এনেছেন তার বইয়ে সুক্ষাতিসুক্ষ তথ্যসহ। প্রসঙ্গক্রমে অপারেশন ফার্মগেট চেকপোস্টের কথা উল্লেখ করা যায়।

ফার্মগেটের বড় মোড়টা এখনকার মতো তখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখান থেকে সারা ঢাকার ওপর নজরদারি করা যেত। কেননা, ঢাকার বড় বড় রাস্তাগুলো কোনো না কোনোভাবে এ মোড় স্পর্শ করেছে। এখানেই ময়মনসিংহ রোডের ওপর ছিল পাকিস্তান আর্মির চেকপোস্ট। এ রোডের সঙ্গে পশ্চিমে মানিক মিয়া এভিনিউ এবং পূর্বদিকে তেজগাঁও রোড। এর সঙ্গে মিশেছে ইন্দিরা রোড ও গ্রিনরোডও। তাই দেখা যায় উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যেদিক থেকেই যানবাহন চলাচল করুক না কেন, এ চেকপোস্ট পার হয়ে যেতে হতো। ফলে পাকিস্তানি আর্মিরা চেক করার নামে সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি করতো। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিভিন্ন কাজে ফার্মগেট অতিক্রম করার সময় সমস্যায় পড়তে হতো। লেখকেরই এক সহযোদ্ধা বদি প্রথম প্রস্তাব করলো এ চেকপোস্ট উড়িয়ে দিতে হবে। শুরু হয় আলোচনা ও পরিকল্পনা। বদি, স্বপন ও লেখক খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন এ অপারেশনের সমস্যা ও সম্ভাবনা। ধানমন্ডির গোপন আস্তানায় বিস্তর শলাপরামর্শের পর ঠিক করা হলো অভিযানের পরিকল্পনা। দুই দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করা হবে। প্রথম দল আঘাত হানবে ফার্মগেট চেকপোস্টে আর দ্বিতীয় দল আঘাত হানবে চেকপোস্টের অদূরে

২০০০ : ঢাকায় ঢোকার পর গেরিলারা তো বিভিন্ন গোপন আস্তানায় থাকতো। আপনারা যোগাযোগ রক্ষা করতেন কীভাবে?

হাবিব : সময় দেয়া থাকতো, কখন কোথায় দেখা করতে হবে।

২০০০ : বই পড়ে জানলাম যে আপনারা বেলুনে গ্যাস ভরে এর সঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকশ' পাতাকা বেঁধে ঢাকার আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ আইডিয়া কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল?

হাবিব : এটা পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্টের ঘটনা। সুনির্দিষ্টভাবে মনে নেই, তবে মনে হয় এই আইডিয়া ছিল শাহাদত ভাইয়ের দেয়া।

২০০০ : আপনার বই থেকে জানলাম সেক্টর-২ থেকে রণাঙ্গনে লড়াই নামে একটি পত্রিকা বের হতো। সেই 'লড়াই' পত্রিকা সম্পর্কে বলুন।

হাবিব : এখানেও আবার শাহাদত ভাইয়ের প্রসঙ্গ চলে আসে। বলতে গেলে সেক্টরে বা ঢাকায় শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গেই আমি সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছি। শাহাদত ভাই ছিলেন 'লড়াই'-এর সম্পাদক। এটা সেক্টর ২-এর নিজস্ব পত্রিকা ছিল। পত্রিকাটির তিনটা সংখ্যা বেরিয়েছিল। মোট ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকা ছিল এটি। আগরতলা থেকে ছাপা হতো।

২০০০ : ধরা পড়লে গেরিলারা কী করবে এ ব্যাপারে কী নির্দেশ ছিল? তারা আত্মহত্যা করবে, তবুও তথ্য দেবে না- এমন ছিল কি?

হাবিব : দায়িত্ব হচ্ছে কোনো প্রকার তথ্য ফাঁস না করা। তবে তখন অব্দি যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যারা তথ্য দেয়নি। আর যারা দেয়নি তারা মারা গেছে। যেমন বদি দেয়নি, তাই মারা গেছে। আর দিলেও মেরে ফেলতো।

২০০০ : যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণকে একজন যোদ্ধা হিসেবে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

হাবিব : ভারতীয়রা নিঃসন্দেহে যুদ্ধ করেছে। তা ছাড়া স্বাধীন করা মুশকিল ছিল। ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হতো। দেরি হতো, কিন্তু স্বাধীন হতো।

২০০০ : নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানানোর দায়িত্ব কি শুধু অভিভাবকদের? রাষ্ট্রের কিছু করার নেই?

হাবিব : অবশ্যই রাষ্ট্রের দায় আছে। কিন্তু দুটো রাজনৈতিক দলই সে কাজ ব্যর্থ হয়েছে- এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যর্থতার জন্য আমি আওয়ামী লীগ-বিএনপিকেই দায়ী করি। একটি দেশ টিকে থাকে তার নায়কদের ওপর ভর করে। আর আমাদের নায়ক হলেন বঙ্গবন্ধু বলেন, সেক্টর কমান্ডাররা বলেন আর মেজর জিয়া বলেন তারাই। কিন্তু এই দুটি রাজনৈতিক দলের কেউই বঙ্গবন্ধু বা জিয়া কাউকেই আর 'হিরো' পর্যায়ে রাখলেন না, বানালেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখন আমাদের জাতির কোনো হিরো নেই। এজন্য দুই দলই দায়ী। এরা প্রজন্মের কাছ থেকে নায়কদের সরিয়ে দিয়েছে। ভারতের তো এই সমস্যা নেই। তাদের গান্ধী আছে, সুভাষ বোস আছে। আর আমাদের এখানে এখনই তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম শুনি না। তারা না থাকলে এ রকম একটা যুদ্ধ করা সম্ভব হতো না। বর্তমান দলগুলো ঘটনার প্রকৃত নায়কদের প্রাপ্য সম্মান যেহেতু দিতে পারছে না। সে জন্য তারা নিজেরাও সম্মান পাচ্ছে না। তখন তো সবাই 'জয় বাংলা' বলেছে। এখন তো সবাই বলে না। কুক্ষিগত করে নিলে চলবে না। 'জয় বাংলা' কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

২০০০ : এখন তো পাঠ্যবইয়েও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ভুল তথ্য...

হাবিব : ইতিহাস গেলানোর ব্যাপার না, বোঝার ব্যাপার। যারা এ ন্যক্কারজনক কাজ করছে তারা ভবিষ্যতে এর ফলাফল টের পাবে। সে জন্যই বলি অভিভাবকদের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে।

আমি আশাবাদী এ দুষ্ট রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন থেকেও আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো। কারণ বৃহত্তর জনসমাজ কখনো ভুল করে না। জনগণকে মাঝে মাঝে ধোকা দেয়া যেতে পারে কিন্তু সব সময় না।

২০০০ : আপনারা যখন ঢাকায় গেরিলা অভিযান চালাচ্ছেন তখন ঢাকার ভেতরের অবস্থা কেমন ছিল? লোকজন রাস্তায় বের হতো?

হাবিব : হ্যাঁ অবশ্যই। আমরা চাইতাম লোকজন বের হোক। লোকজন বের না হলে তো গেরিলা অপারেশন করা যাবে না। আমরা তাদের কাছে নির্দেশনামূলক লিফলেট পাঠাতাম। কী কী করলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাহায্য হবে তা লেখা থাকতো লিফলেটে।

২০০০ : ঢাকার ভেতরে লোকজনের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আপনারা অনেক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন?

হাবিব : প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। আবার এমনও হয়েছে, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

দারুল কাবাব রেস্টুরেন্টে। ওখানে পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের জারজ দোসর রাজাকার-আলবদররা খাওয়া-দাওয়া করে। তাই চূড়ান্ত হলো এ দুটো স্পটেই যুগপৎভাবে আক্রমণ চালানো হবে। রেস্টুরেন্টে হামলার জন্য দ্বিতীয় দলের দায়িত্বে আছেন আলী আহম্মেদ জিয়াউদ্দীন। আর চেকপোস্টে হামলার প্রথম দলের দায়িত্বে আছেন আলোচ্য বইয়ের লেখক হাবিবুল আলম। তার সঙ্গে আছেন বদি, স্বপন, মায়া ও পিলু। আক্রমণের সময় ঠিক করা হয়েছে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট।

টয়োটা সেডান গাড়িটা ধীরলয়ে এগিয়ে চলেছে ফার্মগেটের দিকে। হলিক্রস কলেজের গেটের পাশেই গাড়িটা থেমে গেল। হেডলাইট বন্ধ। সন্তর্পণে নেমে গেল যোদ্ধারা। নিঃশব্দে তারা এগিয়ে চলেছে ত্রিভুজাকৃতি সড়ক দ্বীপের চেকপোস্টের দিকে। মওকা বুঝে প্রথমেই গুলি ছোঁড়লেন লেখক। নিমিষে পাহারারত তিনজন সেনা ধরাশায়ী। ইতিমধ্যে বদি, স্বপন ও মায়া তাঁবুর দিকে শুরু করলো অবিরাম চার্জ। প্রকম্পিত ফার্মগেটের আকাশ-বাতাস, দুলে উঠেছে ভূমি। চারজন যোদ্ধার অস্ত্র থেকে অবিরত গুলির শব্দকে তখন লেখকের কাছে মনে হয়েছে আওয়াজ বিটোভেনের পঞ্চম রাগের (সিম্ফনি) চেয়ে কোনো অংশেই কম শ্রুতিমধুর নয়।

তাঁবুর ভেতর থেকে কিছু গোঙানির শব্দ আসছে। তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য হাবিবুল আলম আরো কয়েক রাউন্ড এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়লেন। ইতিমধ্যে স্বপন ফিরে আসার নির্দেশ দিল। সবাই আবার গাড়িতে উঠে রওনা দিল। একটি সফল অভিযান। কিন্তু সমস্যা বাধল দ্বিতীয় ধাপের অভিযান দারুল কাবাব রেস্টুরেন্টে। প্রথম গ্রুপের ছোঁড়া আনারস টাইপের ভারতীয় গ্রেনেডগুলো ফাটেনি। ফলে দ্বিতীয় গ্রুপ সংকেত পায়নি। তাই দারুল কাবাব রেস্টুরেন্টে আক্রমণ করা হয়নি। সারা রাত আর কোনো পাকিস্তানি আর্মি তাদের মৃত সঙ্গীদের লাশ নেয়ার সাহস পায়নি। লাশ সরিয়েছে পরদিন সকালে। গেরিলারা হিসাব করে দেখল, গুলি শুরু থেকে অপারেশন শেষ করা পর্যন্ত তাদের সময় লেগেছে ৯২ সেকেন্ড আর গুলি খরচ হয়েছে ৯৬ রাউন্ড। উল্লেখ্য, ফার্মগেট অপারেশনে অসাধারণ অবদানের জন্য লেখক হাবিবুল আলম 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত হন।

লেখক তার বইয়ে সবিস্তারে সেক্টর ২-এর অস্থায়ী কার্যালয় 'মতিনগর' ও পরবর্তীতে স্থায়ী কার্যালয় 'মেলাঘর'-এর বর্ণনা তুলে ধরেছেন। আছে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের কার্যক্রমের বর্ণনা ও সার্বক্ষণিক সেবাদানকারী একদল অদম্য তরুণ-তরুণীর নিরলস সেবাদানের বিবরণ।

তার লেখা থেকে জানা যায় নগর গেরিলাদের মানসিক চাপ, উত্তেজনার কথা, গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকার দুশ্চিন্তা, পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যে নির্ভুল আঘাত হানার মনোদৈহিক অস্থিরতা ও ইত্যকার অনেক বিষয়। সাল, তারিখ, ঘটনার নায়ক-নায়িকার নাম ও বর্ণনা, ঘটনাস্থলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি লেখকের সহজ, সাবলীল ও বৈঠকী ঢঙের বর্ণনাশৈলীর কারণে বইয়ে বিবৃত ঘটনার সঙ্গে মিশে যেতে হয় মনের অজান্তে। আবার মাঝে মাঝে প্রচন্ড ঝুঁকিপূর্ণ ও গোলাগুলিপূর্ণ একটি ঘটনাকেও লেখক বর্ণনা করছেন একটু শ্লেষমিশ্রিত বা কৌতুক ছলে। যা নিশ্চিত এই লেখকের কবি মনের পরিচয় প্রমাণ করে। ভাবতে থাকি, হাতে রাইফেল আর পরনে ট্রাউজারের পকেটে গ্রেনেড নিয়ে যুদ্ধরত যে গেরিলা যোদ্ধা, তিনি তখনও কবি।

বইয়ের নাম : ব্রেভ অব হার্ট
লেখক : হাবিবুল আলম বীর প্রতীক
প্রকাশক : একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিসার্স লাইব্রেরি
দাম : ৩৭৫ টাকা